লাউডগা

তৃপ্তি সান্ত্রা

কার্তিকের রাত। আগের দিন পূর্ণিমা গেছে। হাল্কা নীল বেডশিটের মতো আকাশে চাঁদের বালিশ ফেটে উড়ছে জোছনার মিহি তুলো। ঘুম ভেঙে বারান্দার পাশে বাথরুমে যাবার সময় কল্যাণী হিম সবুজ লাউডগাটিকে দেখে। গোলাপি প্লাস্টিক ঝুড়ির কোলে হিলহিসে সবুজ ডগা, ঠিক যেন সবুজ স্কার্ট পরা সাদা উরুর কচি মুখার্জি দাঁড়িয়ে আছে স্থলপদ্ম গাছের নিচে। কচি মুখার্জিকে ভাবতে না ভাবতেই সেই সবুজ ডগা করুণ মুখে বলে — শুধু শুধু পুরনো বাড়ির কথা কেন জিজ্ঞাসা করলে রুনুকে? মন খারাপ হয়ে গেল তো! চল বাইরে ঘুরে আসি, বেশ চিঠির মতো হাওয়া।

তারপর একটু বোকা বোকা হেসে সে বলে — মিমি, আমাকে দেবার জন্য বিকাশ একটা চিঠি দিয়েছিল জয়কে। একটু খুঁজে দেখবে?

মিমি নামটা লুপ্তপ্রায়। বাবা, মা, দাদা - বৌদি আর শেষে রণজয় ডাকতো। পুরনো মানুষেরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো নামও হারায়। মা, মাসীমা, কাকীমা ডাক শুনতে শুনতে কল্যাণীর কান পচে যায়। মিমি মিমি মিমি — ছোটো থেকে এই সেদিন অব্দি রণজয় তাকে এই নামে ডেকে ডেকে অস্থির হতো। মিমি নামটা হারিয়ে যেতে দেয়নি কল্যাণী। তখুনি মনে হল, আচ্ছা বন্ধু বলছি কাকে? কচি মুখার্জি নামে সত্যিই তার কোনও বন্ধু ছিল না। বয়স ষাট ছুঁই ছুঁই হলেও কল্যাণী বুড়িয়ে যায়নি, স্মৃতি প্রখর। বাল্য, কৈশোর, যৌবন সব বয়সের বন্ধুদের তার মনে আছে। এমন কী প্রাইমারিতে দুই এক মাসের জন্য পড়তে আসা রাত্রি, খুব পাতলা চিক্ চিক গলার জবা, লম্বা বেণীর ফুলোগালের বিজয়া —কাউকে ভোলেনি কল্যাণী। কিন্তু কচি মুখার্জি কেন? মনে পড়ছে না তো! কচি আবার বিকাশের চিঠি চাইল তার কাছে! কল্যাণী কি মেইল বাক্স, আর. এম. এস ভ্যান? ভানের সঙ্গে অনেক স্মৃতি কলেজ হস্টেলের। লাল একটা গাড়ির জন্য সপ্তাহ ধরে প্রতীক্ষা ছিল তাদের। পোস্টাপিসে খালাস করে গাড়িটা যখন ফিরে যেতো তখন তাকে কী রকম রোগা লাগতো! কলিটা মহাদুষ্টু, বলতো ঐ দেখ, খালাস করে কেমন ঝাড়া হাত পা হয়ে বাড়ি ফিরছে।

তো, প্রথমে সেই গাড়ির জন্য সবারই উশখুশ। তারপর উত্তীনদার জন্য প্রতীক্ষা। পোস্টাপিস থেকে হাতে গোছা ধরা চিঠি নিয়ে আসে উত্তীনদা। কী অদ্ভুত নাম। পাথরের মতো নিষ্প্রাণ মুখ। দম দেওয়া পুতুলের মতো হাঁটা আর কী যে খেস্টু মানে খ্যাস্টা মানে রসকষহীন। তো রসকষহীন পত্রবাহকের জন্যই মিমি, কলি, ঝিকি সবাই হা পিত্যেশ করে বসে থাকতো। যদি একটা চিঠি আসে। বাড়ির। রণজয়ের, অলকদার কী বিশ্বরূপের। আর এই মাঝরাতে অচেনা কচি মুখার্জি তার কাছেই চিঠি চাইছে। বেশ অবাক লাগছে কল্যাণীর। বিকাশ —বিকাশ কি জয়ের বন্ধু? রণজয় চিঠিটা বিকাশকে না দিয়ে কোথায় রেখেছে — কে খুঁজবে। কোথায় খুঁজবে। রণজয়ের ঘর টেবিল বুক সেলফ — সব তছনছ।

কচি মুখার্জি — সবুজ স্কার্ট, সরু ফর্সা উরু। স্থলপদ্ম গাছের নিচে দাঁড়িয়ে। বেশ রোমান্টিক মায়াময় সবুজ মেয়েটি। সে কেমন বোঝে এই বয়সে এসে নিজের ঘর বাড়ি ছেড়ে বদ্ধ ফ্ল্যাটে উদ্বাস্তু হবার কষ্ট। কেমন তাকে বাইরে নিয়ে যেতে চাইল কচি। আর চিঠিটা চাইল কী রকম লজ্জা প্রতীক্ষা মাখা গলায়। ঠিক যেন রাইকিশোরী। রূপোলি তুলোর জোছনায় কল্যাণী কিছুতেই কচি মুখার্জিকে চিনতে পারল না। কিন্তু সবুজ লাউ ডগাটিকে খুব চেনা চেনা লাগল তার। অনেক দিনের চেনা। পাকালো নাভিকুণ্ডলের মতো।

মুখে রুচি নেই। একটু শিউলি পাতার বড়া, পোস্ত দিয়ে লাউডগা বাঁধার কথা কল্যাণীই বলেছিল। কলোনির পাঁচ-ছয় কাঠার জমির বাড়িতে এইসব গাছপালার সুবিধা ছিল না। এখন কিনে আনতে হয়। রক্তে কোলেস্টেরল বেড়ে গেছে। মাংস, ডিম অনেকদিন আগে রণজয় থাকতেই বাদ দিয়েছে কল্যাণী। এখন বড় মাছ তো বাদ গেছেই, তেল দিয়ে মুড়ি মাখা পর্যন্ত বাদ। মাগো, কী বিচ্ছিরি বুড়োদের মতো প্যাটপেটে খাওয়া। আগে সন্ধেবেলায় ঝুমা কী রুনু কী রণজয় বাইরে বেড়াতে গিয়ে চপ, সিঙ্গারা না নিয়ে খালি হাতে ফিরলে প্রচণ্ড খেপে যেতো কল্যাণী। ফোয়ারা মোড়, রাজধানী, থানা মোড় সবই ঘুরে খালি হাতে এলে? মিমির দেখাদেখি রুও শিখেছে এইসব তেলেভাজা খাওয়া। তোমার পাল্লায় পড়ে রু-টা গোল্লায় যাচ্ছে — খুব বলতো রণজয়। নাও, সব বাদ গেছে এখন। তুমি খুশি তো? তেঁতো নয়, মুখটা কী রকম বিস্বাদ! পাতে নুনটা পর্যন্ত খেতে দেয় না ঝুমা। তো স্পেশাল মেনু শিউলির বড়া। লাউয়ের ডগা। ঝুমা এসব খুব গুছিয়ে পারে। রান্না, পরিবেশন সব কিছুই বেশ পরিপাটি। রণজয়ের খাওয়া দাওয়া বেশ ভালোই ছিল। ডাল তরকারি ভাজা ঝোল বেশ সপসপিয়ে খেতে ভালবাসতো। বড় কাঁসার থালায় অভ্যেস ছিল। ভাত ভীষণ প্রিয়, খানিকটা তেতোই ছিল রণজয়। সুগারে ভাত, সব্জি সব মাপা হয়ে গেলেও বড় থালাও বিদায় নিল। বিশাল থালায় এটু খানি ভাত দেখতেও কেমন লাগে। আর পুরনো অভ্যাসে কল্যাণী বড় থালায় অল্প করে দিতেও পারত না। ঝুমা ছোটো ছোটো রঙিন কাঁচের বাটি আর কাঁচের সাদা প্লেটে খাবার দেওয়া চালু করেছিল। রণজয় খুব মজা করতো সেই নিয়ে — মিমি, তোমার জাবদা ছাপাখানার দিন শেষ। দেখো কেমন ছিমছাম পরিবেশন করে জুমা, ঠিক যেন ম্যাপলিথো কাগজের ওপর ডিটিপি হরফ।

উঠোনের পাশে এল ছাদের বারান্দায় খেতে বসতো রণজয়। বেশ রোদ পড়ত পিঠে। তুলসী তলার পাশে টগর গাছটা ছিল ছাতার মতো। খেয়ে উঠে কাটাকুটি দিয়ে ভাত মেখে কুয়োতলায় প্যারিকে দিয়ে আসা তারপর উঠোনে চেয়ার পেতে একটা সিগারেট। ডাক্তারের বারণ ছিল কিন্তু ল্যাট্রিনের আগে আর খাবার পরের অভ্যাসটা বাদ দিতে পারেনি রণজয়। কুয়োটা খুব ব্যবহার হত না তবু

ছিল। কুয়োর পাশের মাটিতে ফনফনিয়ে উঠেছিল লাউগাছ। কঞ্চি দিয়ে মাচা বাঁধা আর ঘটের মতো লাউ ভালোবাসত না রণজয়। চিংড়ি দিয়ে না রাঁধলে খেতোও না। গাছের শখ ছিল। কতরকমের গাছ যে লাগিয়েছিল জীবনে — এক এক সিজনে, এক এক রকম। এক এক বছরে এক এক রকম। রুনু বিকেল বেলায় লাউ ডগা নিয়ে এলে কল্যাণী মুখ ফস্কে বলে ফেলেছিল — কোত্থেকে আনলি, ও বাড়ির? — কলোনির বাড়ির কী না জানতে চাইছো? না - না - ও বাড়ির কী করে হবে। ওখানে তো আজ চারতলার ঢালাই হয়ে গেল। পুরোটা একবারেই হল — ব্যানার্জিদের বাড়ির দিক থেকে একেবারে আমাদের কুয়োতলা পেরিয়ে লাউমাচা অব্দি। ওসব গাছপালা তো কবেই কাটা হয়ে গেছে। তুমি তো একবারও গেলে না। আমাদের একটা ফ্ল্যাট একতলায় অন্যটা পাঁচতলায়। মাটির কাছাকাছি থাকা যাবে আবার পাঁচতলা থেকে চাঁদেও যাওয়া যাবে...

রুনুর পুরো ফ্লো এসেছে। সে বলে যায়। কল্যাণী শুনেও না শোনার ভান করে। তাইতো! ওবাড়ির কী করে হবে — সত্যিই মাথাটা তার গেছে। ও পাড়া থেকে চলে আসা, ত্যা তো প্রায় বছর ঘুরতে চললো। রুনু নানা গল্প বলে — অন্যান্য বাড়ির ফ্ল্যাট হবার গল্প। পাঁচ, সাড়ে পাঁচ কাঠার জমি নিয়ে বাড়ির থাকাটাই কাল হল কলোনির — প্রোমোটারে, প্রেমোটারে ছেয়ে গেল পাড়া। রোজই নিত্য নতুন খবর আনে রুনু — সাহেবদের বাড়িটা ভাঙা হচ্ছে কী চৌধুরিদেরটার কথা হচ্ছে। কোন প্রোমোটার কত দিচ্ছে। আমরা একটু ঠকেই গেলাম মা — রুনু নানা কথা বলে। ভালো লাগেনা কল্যাণীর, সে পালাতে চায়।

কোথায় পালাবে? ঘরের কথা ভালো না লাগলে বারান্দার সেই সিমেন্টের ধাবি বা বেঞ্চে বসার অভ্যাস ছিল। পাশে আমগাছ। সামনে নদীর মতো স্রোত। কতলোক হাঁটা চলা করে রাস্তা দিয়ে। বেশ সময় কেটে যেত। মন খারাপ করে কল্যাণী ভাবে, যাই সেখানে বসি। আবার ভুল। কোথায় সেই বারান্দা? সেও তো পুরনো পাড়ায়, পুরনো বাড়িতে। ভাড়াবাড়ির ছোট্ট গ্রিল দেওয়া বারান্দায় সেই পুরনো বসার ধাবি খুঁজে না পেয়ে একবার নিজের ঘরে ঢুকে চৌকির তলায় উঁকি মেরে দেখেছে কল্যাণী— যেন বারান্দার ধাবিটা চৌকির তলায় ঘাপটি মেরে বসে আছে। তারপর ভীষণ মন খারাপ করে ঘাটে এসে বসে কান্না চেপেছে। রণজয়ের ওপর অভিমানে চোখে জল আসে তার। বেশ মজা না! নিজে তো যেমন যেমন চাইলে তেমনই পেলে। হাসপাতালে ছোটাছুটি না, ফ্ল্যাটবাড়িতে ঘুমসে ঘুমসে মরা না, বেশ ঘুমের মধ্যেই বাড়ি যাওয়া আর তুলসীতলার পাশে সেই যে ছাতার মতো টগর গাছ — যার তলায় তোমার মা, বাবা শুয়েছিলেন তার তলায় যেন নিশ্চিন্তে শুয়ে হাসতে হাসতে চলে গেছে। লোকের কত প্রশংসা। কী মহাপ্রাণ— কেমন ডঙ্কা বাজিয়ে চলে গেলো রনো দা, মুখে রয়ে গেলো চিরদিনের খোলামেলা নিজের বাড়ি ছেড়ে দুকামরার ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকতে — একবারও জানতে আসো! কান্না, আবেগ চাপলে মুখ চোখ লাল হয়ে যায় কল্যাণীর। রণজয়, দুর্জয় দুই ভাই। তাদের দুই জনের তিন ছেলেমেয়ে — গাছগাছালি নিয়ে ছয় কাঠার ওপর দাদুর বাড়িটা রাখতে পারল না নাতি নাতনিরা। প্রোমোটার বাড়ি নিয়েছে, ছয়তলা ফ্ল্যাট হবে। মা, মেয়ে, বউকে নিয়ে রুনু পাশের পাড়ায় ভাড়া আছে বছর খানেক। কাজ শেষ হতে আরো ছমাস লাগবে — তারপর ঝাঁ চকচকে নতুন ফ্ল্যাট। রুনু সেই আনন্দে মাতাল।

রণজয় ভালো চাকরি করতো। যথেচ্ছ আদরে নানা রকম বড়লোকি চাল হয়েছে ছেলেটার কিন্তু নিজে তেমন কিছুই করতে পারেনি। ভাগ্যিস জোর করে বেসিকটা করিয়েছিল কল্যাণী তাই যাইহোক একটা বাঁধা মাইনের চাকরি হয়েছে। কিন্তু বাঁচা মানে তো আর আগের দিনের মতো সাধারণ খাওয়া পরা নয় — যুগের সঙ্গে তাল মেলানো। তা করতেই দাদুর ভিটেয় হাত। ঠাকুরপো দুর্জয় মুখিয়েই ছিল, রণজয় চলে যেতে কাজটা হয়ে গেল রুনুর।

কল্যাণীকে প্রস্তাব দেবার সময়ও এমন ঘোরে ছিল রুনু। নতুনের ঘোর তিরবর্গার পুরনো ছাদ, মাটির গাঁথনির বাড়ি। এসবের পেছনে নতুন করে পয়সা খরচের মানে হয়না, আমার ক্ষমতাও নেই। ভালো দাম দেবে। তুমি না কোরো না মা। অবলীলায় রুনু বলে গেছিল, একবারও মায়ের মুখের দিকে তাকায়নি। কাঠের তিন চাকা গাড়ি ফেলে নতুন তিন চাকা শৌখিন সাইকেল রিকশ কেনার আনন্দে ছেলেবেলায় যেমন মুখ ঝলমল করতো, ঠিক তেমনই আলো ছিল মুখে। এমনকী ফ্ল্যাট হয়ে যাবার অনিবার্যতা আর গাছমাটি রাখার ভুলভাল সেন্টিমেন্ট মন থেকে বাদ দেবার জন্য রুনু - রাজনীতির প্রসঙ্গও এনেছিল। সরাসরি রাজনীতি না করলেও সাম্যবাদে বিশ্বাসী রণজয় মার্কসবাদী রুলিং পার্টিকে আমৃত্যু ভোট দিয়েছে। আস্থা রেখেই। কল্যাণীও দিয়েছে। জমিজমার বদলে শিল্পে ধ্যান দেবার যে সরকারি সিদ্ধান্ত, কৃষিজমি নিয়ে যে পদক্ষেপ — সেই উন্নয়েনের সুড়সুড়িও দিয়েছে রুনু — বাবা বেঁচে থাকলে, নতুন করে ভাবতো মা। লোকসংখ্যা বাড়ছে, শুধু জমিজমায় আটকে থাকলে চলে না। নতুন নতুন কারখানা, নতুন ফ্ল্যাট, নতুন নতুন বাজার। কত উন্নতি ঘটেছে ভাবতো। সাধারণ মধ্যবিত্ত কখনও ফ্রিজ টিভির কথা ভাবতে পারত? এখন তো গাড়ির কথাও ভাবতে পারছে তারাও। চারচাকার গাড়ি মধ্যবিত্তর স্বপ্ন। সরকার সে স্বপ্ন পুরুণ করতে চলেছে। বাবা দেখে যেতে পারল না।

কল্যাণীর নির্বিকার মুখ দেখে রুনু আবার শুরু করে — জমি নিচ্ছে, তার বদলে থোক টাকা দিচ্ছে, এতে গ্রামের লোকের না বলার কী আছে বুঝি না বাবা। বিরোধীদের উস্কানি।

কল্যাণী বিরোধী হতে চায়নি। জানে না করে লাভ নেই, না করেনি। কিন্তু এ খোলামেলা বাড়ির বদলে খুপরি ফ্ল্যাটে বাকি জীবন কাটানোর কথা ভাবতেও পারেনি। গ্রাম সম্বন্ধে তার কোনও ধারণা নেই। জমিজমা কখনও ছিল না। তবু গৃহস্থ বাড়ি থেকে উচ্ছেদের এই টানা পোড়েনে জমি হারানো মানুষের সঙ্গে কোথায় যেন একটা আত্মীয়তা তৈরি হয়। বাড়ি হারিয়ে তারা তো সেই জমিতেই ফ্ল্যাট পাচ্ছে —

জমি হারানোর মানুষেরা কোথায় যাবে, তাদের তো চাকরির থোক টাকাও নেই, তবে?

খুব ভালো রাজনীতি বোঝেনা কল্যাণী, কিন্তু রুনুকে সমর্থন করতে পারেনা। বলেও না কিছু ভালো লাগেনা।

ঝুমা, রুনু অনেক দিন নতুন ফ্ল্যাট তৈরির কাজ দেখতে যেতে বলেছে — কল্যাণী যায়নি। ইচ্ছে না থাকলেও তাকে নানা রকম গল্প শুনতে হয়। বাড়িতে যারা আসে তারা নানা রকম খবর আনে। বাড়ি ভাঙার গল্প শোনায়। উঠোন পেরিয়ে পুরনো রান্নাঘর, ফ্ল্যাট তৈরির লেবাররা সেখানেই আছে। ভাঙা হচ্ছে বাইরের ঘর, আড্ডা দেবার সিমেন্টের বেঞ্চ, শোবার ঘর। আজ টগর গাছ, আম গাছ কাটা হল। কুয়োর পাশের লাউমাচা, সব্জিবাগান কাটা হল — এই সব নানা গল্প। কল্যাণী শুনতে চায়না। চোখ বন্ধ করে থাকে। যেন তাহলেই সব আটকানো । যায়। লাউগাছ অনেক দিন আগে কাটা গেছে, তবু রুনুর হাতে লাউডগা দেখে অনিবার্য ভাবে মুখ দিয়ে কেন যে বেরিয়ে গেল — ও বাড়ির?

ডগা খাওয়া নিয়ে রণজয়ের সাথে খুব লাগতো। দুই একটা ডগা কাটলে কী হয়, কিন্তু রণজয় কাটতে দিতে চাইত না। লাউডগা কাটতে কল্যাণী ভয় পেত। লাউগাছে সবুজ লাউডগা সাপ থাকে না? কেমন ডগার সাথে মিশে থাকে, যদি কামড়ে দেয়? সুতরাং রণজয়কে তোলাতে হত—

— এ্যাই, দুটো ডগা কেটে দাওনা
— নিজে যাও।
— আমার ভয় লাগে।
— ইস! ক্লিওপেট্রা আমার! সাপে ভয়!

ফর্সা নয় তবে চমৎকার ফিগার ছিল তার। হাঁটাটা রাজকীয়। ইংরিজির ছাত্র রণজয়ের কাছে কল্যাণী কখনও শেক্সপীয়ারের ডার্ক লেডি, কখনও ক্লিওপেট্রা। খুব পেছনে লাগতো রণজয়। সবুজ ডগা কেটে এনে হঠাৎই বুকের ওপর ফেলে দিত। এ্যাই, একদম ভয় দেখাবে না—ভীষণ ভয় পেতো কল্যাণী। ডগা তো সেই কাটবে তবু হঠাৎ করে লতানো কিছু গায়ের ওপরে পড়লে গা কেমন শিরশির করে না?

আর এই কার্তিকের মাঝ রাত। বাথরুম থেকে ফিরে এসে বারান্দায় আবার কচি মুখার্জির সঙ্গে দেখা। চরাচর অপার্থিব। বারান্দার গ্রিলে তালা মারা নইলে এই রকম রাতে সমুদ্রে নেমে যাওয়া যায়। সবুজ ডগাটির দিকে চোখ ফেলতেই আবার সে বলে — শরীর কেমন করছে? বাইরে যাবে? গোলাপি ঝুড়ি থেকে কল্যাণী তুলে আনে কচি মুখার্জিকে। বলে — অ্যাই তোমাকে না আমি চিনতে পারছিনা। কোথায় যেন, কোথায় যেন... হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সবুজ মলাটের একটা কবিতার বইয়ে, রণজয়ের প্রিয় কোনও অনুজ কবি বন্ধুর বইয়ে তুমি ছিলে। সেই বুঝি বিকাশ। বিকাশ তোমাকে দেবার জন্য চিঠি দিয়েছিল রণজয়ের হাতে, রণজয় বুঝি তোমায় দেয়নি। কিন্তু আমি কী ভাবে খুঁজবো। রণজয়ের ঘর, টেবিল, বুক সেলফ কোথাও তো নেই...

কতা বলতে বলতে কল্যাণীর গলা আটকে আসে। পুরনো পাড়ার কোন বাড়িতে ফিরে যাবে সে। একটা স্মৃতির বাড়ি, তাদের রাজ্যপাট সব ঝুরঝুর করে ঝরে পড়েছে। গুঁড়ো হয়ে মিশে গেছে মাটির সাথে। বিয়ের পর প্রথম প্রথম রণজয় লুকিয়ে লুকিয়ে দুপুরে অফিস পালিয়ে বাড়ি আসত। খিড়কির দরজা খুলতে হত আস্তে, পাশে শ্বশুরের ঘর। পায়ের শব্দ পেলেই প্যারী চ্যাঁচাবে। কল্যাণী শব্দ শুনে বেরিয়ে আসে তবে আরো চ্যাঁচাবে। ভীষণ পাজি প্যারী— মেয়েদের দেখে বেশি চ্যাঁচায়। কত কী মনে পড়ে। রুনু টলমল পায়ে উঠোনে হেঁটে বেড়াচ্ছে। গুচ্ছেক জাল মাছ এনেছে রণজয়। লাউ দিয়ে ভালো জমবে। স্মৃতি স্মৃতি স্মৃতি — জলে ভেসে যায় বুক। বাইরে চাঁদের আলো, তুলোর মতো জোছনা যেমন বালি। বালির ওপর বিন্দু বিন্দু কালো। যেন শেকড় হারানো মানুষের নড়াচনা। কল্যাণীও যেন এক হারিয়ে যাওয়া পরাজিত ক্লিওপেট্রা। জলে ভেজা বুকের ওপর স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বেরিয়ে পড়েছে লাউডগা — মিশরের নীল রানির মতো কল্যাণী বুকের ঠিক মাঝখানে লাউডগাটিকে আনে। কে তুমি কচি মুখার্জি? লাউডগাটি কচি তাই কী সবুজ স্কার্ট পরা কচি মুখার্জির নাম মনে এলো! রণজয় একটা সবুজ মলাটের বই পড়ত, ওর বন্ধুর বই। সেই বইয়েরই এক কবিতার মেয়ে মাঝরাতে তার কাছে চিঠি চাইছে। এই রাতে লাউডগা অচেনা কচি মুখার্জি হয়ে ডাকছে নাকি এক স্মৃতির জগৎ লাউডগা হয়ে। ছমছমে মৃত্যু শীতল ডাক। ক্লিওপেট্রার বুকের ওপর অ্যাসন্, সে কী স্মৃতির ইজিপ্ট? ঝাঁপ খুলে দিলে ছোবলে ছোবলে নীল হয়ে যায় পৃথিবী। বাইরে ডাকছিল না মেয়েটা, কী যেন বলছিল খুউব হাওয়া চিঠির মতো ... কল্যাণী স্মৃতিহীন কুঠুরিতে ঢুকতে চাইল না। মরুভূমির জোছনায় প্রত্নবালি হয়ে ছড়িয়ে যেতে চাইল। বেরিয়ে এলো অচেনা কচি মুখার্জির হাত ধরে।

পরদিন ঝুমা বারান্দায় কল্যাণীকে প্রথম দেখে — বুকে জড়ানো লাউডগা। কাঁদতে থাকে — সকালেই তো রান্না করতাম, মা কী ভোররাতে উঠেই ডগা কাটতে বসেছিলেন?

গতকাল বিকেলে ডাক্তারের কাছে যাবার কথা ছিল। ছাদ ঢালাই দেখতে গিয়ে রুনু ঠিক সময় আসতে পারে নি। বারবার সেই কথাই বলতে থাকে রুনু। কাঁদে।

কেউই বুকে স্মৃতির বিষদাঁতের দাগ দেখতে পায় না।